পরবর্তী অধ্যায় দুটিতে আমরা আমাদের তুলনায় আলোচ্য কবি — কৃত্তিবাস ও ভানুভক্ত — প্রত্যেকের যুগপরিবেশ আবির্ভাবকাল ও ব্যক্তিজীবন, কাব্যপরিচয়, জাতি ও সমাজজীবনের প্রতিচ্ছবি, আদর্শীকৃত কাব্যের সঙ্গে তুলনা, বর্ণিত কাহিনীর অন্যান্য উৎস প্রভৃতি নিয়ে স্বতন্ত্রভাবে আলোচনা করবো ।

তৃতীয় অধ্যায়

॥ কৃত্তিবাস পরিক্রমা ॥

(ক) কৃত্তিবাসের যুগপরিবেশ

পঞ্চদশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে আবির্ভূত কবি কৃত্তিবাসের যুগপরিবেশটুকু জানা প্রয়োজন। তখনো শুধুমাত্র "আপন মনের মাধুরী মিশায়ে" কাব্যরচনার ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়নি । বিশেষত: যেসমস্ত কাব্য জনসাধারণের জীবনদৃষ্টি, ধ্যানধারণা ও বিশ্বাসের উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে, তাতে যুগের রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিবেশ প্রচুর উপাদান যুগিয়ে থাকে । কৃত্তিবাসের আবির্ভাবের পূর্ববর্তী দু-তিন শতকের রাজনৈতিক-সামাজিক পটভূমি তাই সংক্ষেপে আলোচনা করা দরকার, কেননা সেই পটভূমি বিস্তৃত হয়েছে কৃত্তিবাসের কাল পর্যন্ত, অর্থাৎ মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের আবির্ভাবকাল পর্যন্ত (১৪৮৫ খৃ:)। শ্রীচৈতন্যের অভ্যুদয় এবং হোসেনশাহী আমল (১৪৯৩ - ১৫১৯) বাঙলার রাজনৈতিক-সামাজিক সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় জীবনে "নতুন উষার স্বর্ণদ্বার" খুলে দিল । এখানে তার পূর্বেকার তমসাচ্ছন্ন যুগটির কথা আমাদের জানতে হবে ।

দ্বাদশ শতকে বাংলাদেশের সেন বংশীয় রাজা লক্ষ্মণসেনের রাজত্বকালে তুর্কী আক্রমণে বিধ্বস্ত হয়ে গেল চারশো বৎসর ধরে (৮ম থেকে ১২শ শতক) পাল ও সেন রাজাদের আমলে গড়ে-ওঠা বৌদ্ধ ও পৌরাণিক হিন্দু সংস্কৃতির ভিত্তিভূমি । তখনকার রাজনৈতিক ও

সামাজিক অবস্থা যদিও কম জটিল ছিলনা, তবু তখনো বাঙালীর পাণ্ডিত্য ও মনীষা ছিল উজ্জ্বল । ১২০২ খৃষ্টাব্দে মহম্মদ বক্তিয়ার খিলজী অতর্কিতে বাংলার রাজধানী নবদ্বীপ ('নুদিয়া') অধিকার করে লক্ষ্মণসেনকে বিতাড়িত করলেন, প্রতিষ্ঠা করলেন মুসলিম শাসন । সেই থেকে বাংলাদেশে মুসলিম প্রভাবের সূচনা । কিন্তু মাত্র অষ্টাদশ অশ্বারোহী নিয়ে বখতিয়ারের নদীয়া জয়ের কাহিনী (মিনহাজউদ্দিনের "তবকাৎ-ই-নাসিরীতে" বর্ণিত) এপর্যন্ত সব ঐতিহাসিকের মনে সন্দেহ জাগিয়ে এসেছে, তাঁরা এই জয়ের যথার্থ কারণও সন্ধান করেছেন । রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে — "বখতিয়ারের নদীয়া বিজয় কাহিনী সম্ভবত অলীক" ।[1] ডক্টর রমেশচন্দ্র মজুমদার বলেছেন — "The story of the unopposed doubts about the truth of the details of the campaign."

[2] লক্ষ্মণসেন যে দুর্বল রাজা ছিলেন না তা তাঁর কলিঙ্গ, কামরূপ, কাশী জয় থেকে বোঝা যায় । ভীতিগ্রস্ত মন্ত্রী-অমাত্যদের পরামর্শ উপেক্ষা করে তিনি বখতিয়ারকে বাধা দিতে চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত পারলেন না । সেই ব্যর্থতার বিস্তৃত ইতিহাসে আমরা যাবো না । তবে তার অন্তর্গূঢ় কারণ ও গভীর তাৎপর্য আমরা জানতে পারবো ডক্টর নীহাররঞ্জন রায়ের নিপুণ বিশ্লেষণ থেকে —

> "আসল ব্যাপার এই যে, যেখানে জনসাধারণ আতংকগ্রস্ত ও পলায়মান, উপদেষ্টা ও মন্ত্রীবর্গ পরাজয়ী মনোবৃত্তি দ্বারা আচ্ছন্ন এবং জ্যোতিষ যেখানে রাষ্ট্রবুদ্ধির নিয়ামক সেখানে সৈন্যদলের ও জনসাধারণের প্রতিরোধ দুর্বল হইতে বাধ্য । এইজন্য কোন প্রতিরোধই কার্যকরী হয় নাই ।...... লক্ষ্মণসেন কাপুরুষ ছিলেন না, তিনি হতভাগ্য ।..... বখতিয়ারের নবদ্বীপ জয় এবং একশত বৎসরের মধ্যে সমগ্র বাংলাদেশ জুড়িয়া মুসলমান রাজশক্তির প্রতিষ্ঠা কিছু আকস্মিক ঘটনা নয়, ভাগ্যের পরিহাসও নয়, রাষ্ট্রীয়, সামাজিক ও সংস্কৃতির অধোগতির অনিবার্য পরিণাম মাত্র ।"[3]

প্রায় তিনশত বৎসর ধরে বয়ে গেল বাংলার উপর দিয়ে অত্যাচার উৎপীড়নের প্রচণ্ড ঝড় । তুর্কীবাহিনীর এবং পরবর্তী পাঠান, খিলজী, হাবসী, মামলুক সুলতানদের ধ্বংসাত্মক

১। রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় — বাঙ্গালার ইতিহাস, ১ম ভাগ, পৃঃ ৩৫৭

২। History of Ancient Bengal : Page 255 · ড: রমেশচন্দ্র মজুমদার।

৩। নীহাররঞ্জন রায় — বাঙালীর ইতিহাস, সংক্ষেপিত সংস্করণ, পৃঃ ২৬৬-৬৭, ২৭৪ ।

ক্রিয়াকলাপ চললো দীর্ঘকাল। মঠ, মন্দির ধ্বংস, লুটতরাজ, অরাজকতা ধর্মান্তরীকরণ প্রভৃতিতে বাঙালী হিন্দু সম্প্রদায় আতংকিত ও নিরাপত্তার অভাবে মুহ্যমান হয়ে পড়লো। হিন্দুদের ভিতরকার দৃঢ়মূল শ্রেণী এবং বর্ণবিদ্বেষও এই মুসলিম অত্যাচারকে শক্তি যুগিয়েছিল। তথাপি এই মুসলিম সুলতানদের আধিপত্যের মধ্যেই একমাত্র হিন্দুরাজা গণেশ (১৪১৫ খৃঃ) স্বাধীনভাবে দক্ষতার সঙ্গে রাজত্ব করেছিলেন এবং কিছুকাল হিন্দুধর্ম ও সংস্কৃতি জাগ্রত রাখতে চেয়েছিলেন। তাঁর সময়ে আবার হিন্দু মন্দির গড়ে উঠলো। সংস্কৃত চর্চা সুরু হলো। তবে তাঁর মাত্র চার বৎসরের ক্ষীণজীবী রাজত্বকালে তা দৃঢ়মূল হতে পারেনি।

এই দুর্যোগের মেঘের আড়ালে রাজা গণেশের সময়টুকুই একমাত্র রজত-রশ্মিরেখা নয়, কয়েকজন পাঠান সুলতানের কাছে আবার হিন্দুরা যোগ্যতাবলে উপযুক্ত মর্যাদাও পেয়েছেন। হিন্দু কবিরা পেয়েছেন রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতা। রাজশাসনে, রাজস্ব ব্যবস্থায় এমনকি সমরবিভাগেও হিন্দুদের প্রতিষ্ঠা ছিল। সুলতান জলালুদ্দীনের দক্ষিণ হস্ত ছিলেন তাঁর একজন হিন্দু মহাক্ষত্রী সেনাপতি। "স্মৃতিরত্নহার" প্রণেতা বৃহস্পতি মিশ্র জলীলুদ্দীনের সভায় সম্মানিত স্থানলাভ করেছিলেন। রুকনুদ্দীন বারবক শাহের উৎসাহ ও পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেছিলেন ভাগবতের অনুবাদ "শ্রীকৃষ্ণবিজয়" রচয়িতা কবি মালাধর বসু এবং রামায়ণের কবি কৃত্তিবাস। মালাধর বসু সুলতানের কাছ থেকে "গুণরাজ খাঁন" উপাধিও পেয়েছিলেন। সামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহ এবং তাঁর বংশধরেরা বাংলাদেশের রাষ্ট্র ও সমাজে শান্তি ও শৃংখলা ফিরিয়ে এনেছিলেন রাজা গণেশের আগে এবং পরে। দুচারজন সুযোগ্য সুলতান ব্যতিক্রমরূপে বিদ্যমান ছিলেন বলেই হিন্দুসমাজ ও সংস্কৃতি একেবারে লুপ্ত হয়ে যায়নি।

যা হোক, এই যুগপরিবেশে আবির্ভূত হয়েছিলেন কবি কৃত্তিবাস। তাঁর সময়ে বাংলাদেশের তমসাচ্ছন্ন রাত্রির অবসানের লক্ষণ কিছুটা দেখা যাচ্ছে। রাষ্ট্রীয় ও সমাজজীবনে বাঙালী হিন্দু যতই পরাভূত ও আত্মসংকুচিত হয়েছে যুগপরিস্থিতির প্রভাবে, ততই সে আঁকড়ে ধরে রাখতে চেয়েছে পৌরাণিক ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতি, আচার-ব্যবহার, ধ্যান-ধারণা। তাই প্রভূত চাপেও উচ্চবর্ণের হিন্দু খুব বেশী ধর্মান্তরিত হয়নি, হয়েছে নিম্নবর্ণের হিন্দুরা। পরিস্থিতি কিছুটা অনুকূল হয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে তাই দেখতে পাই প্রাচীন মহাকাব্য ও

পুরাণের অনুবাদে ও প্রচারে হিন্দুদের উৎসাহ জেগেছে। রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবতের অনুবাদ দিয়ে লোকের মনে স্বকীয় ধর্ম সংস্কৃতির হৃত বিশ্বাস ফিরিয়ে আনার প্রয়াস রয়েছে একদিকে, অপরদিকে দীর্ঘকালের উৎপীড়ন-ভীতি ও শংকাকুলতার জড়তা ও দ্বিধা কাটিয়ে উঠে জাতিকে আত্মস্থ করার জন্যে বাঙালী জীবনের গৃহসংসারে চরিত্রে ও আচরণে যা কিছু আদর্শ, তার মৌল প্রকৃতি — ভক্তি ও কারুণ্য সবকিছুকে পৌরাণিক পরিচিত কাহিনীর মধ্য দিয়ে তুলে ধরার প্রয়াস রয়েছে। তাতে পৌরাণিক জীবনের ও চরিত্রের রূপান্তর ঘটেছে সত্য, কিন্তু বাঙালীর চির-তন চারিত্র-লক্ষণের সঙ্গে সুসংহত হয়ে তা ভিন্নতর মহিমা লাভ করেছে। এইভাবে মুসলিম আধিপত্যের তীব্রতার মধ্যেও বাঙালী জাতি উত্তর ভারতের অর্থ ও সংস্কৃতির সঙ্গে যোগ অক্ষুণ্ণ রাখতে চেষ্টা করেছিল। কৃত্তিবাসের রামায়ণে সেযুগের তমসাচ্ছন্নতার ও তিমির-বিদারী আলোকচ্ছটার আভাস দুই-ই লক্ষ্য করা যাবে। চৈতন্য পূর্বযুগের কবি কৃত্তিবাসের কাব্যে বৈষ্ণবতার লক্ষণ অবশ্যই পরবর্তীকালের সংযোজন, তবু কৃত্তিবাস তাঁর কাব্যে চৈতন্যযুগের জ্যোতির্ময় সম্ভাবনার না-দীপাঠ করে গিয়েছিলেন বলে মনে হয়।

(খ) কৃত্তিবাসের আবির্ভাবকাল ও ব্যক্তি-জীবন

আধুনিক বাংলা কাব্যে রামকথার নবরূপদাতা মহাকবি মধুসূদন গভীর শ্রদ্ধা জানিয়েছিলেন প্রাচীন বাংলা কাব্যে রামায়ণ গানের প্রথম উদ্গাতা মহাকবি কৃত্তিবাসকে এই বলে —

কীর্তিবাস কৃত্তিবাস কবি
এ বঙ্গের অলংকার। (মেঘনাদবধ কাব্য, চতুর্থ সর্গ)

প্রাচীন ও চির-তন এই বঙ্গভূষণ কবির আবির্ভাবকাল কিন্তু এখনো কুহেলিকাচ্ছন্ন, তা বহু বিতর্কিত এক সমস্যার ব্যাসকূট বিশেষ। ডক্টর দীনেশচন্দ্র সেন, অধ্যাপক যদুনাথ বসু, ডক্টর সুকুমার সেন, ডক্টর অমিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ সুধী গবেষক-বৃন্দ কৃত্তিবাসের জন্মসন সম্পর্কিত নানা তথ্যাদি পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচার বিশ্লেষণ করেও এপর্যন্ত কোন সুনির্দিষ্ট সিদ্ধান্তে আসতে পারেন নি। আমরা সেই বিতর্কের অরণ্যে প্রবেশ না করে সাম্প্রতিক কালের প্রখ্যাত কৃত্তিবাস গবেষক অধ্যাপক সুখময় মুখোপাধ্যায়ের যুক্তিযুক্ত বক্তব্যই গ্রহণ করছি —

"তিনি (কৃত্তিবাস) যে পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষার্ধে বর্তমান ছিলেন, সে বিষয়ে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই।"[১]

অনেকের ধারণা, কৃত্তিবাস ৭০-৮০ বৎসর বেঁচেছিলেন।

এত প্রাচীন একজন জনপ্রিয় কবির ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কে আমরা খুব বেশী কিছু জানতে পারিনা তথ্যের অপ্রতুলতার জন্য। তাঁর নানা পুঁথির মধ্যে প্রাপ্ত সুদীর্ঘ "আত্মবিবরণ"-টিকে গোড়ার দিকে অনেকে প্রামাণিক নয় বলে ধারণা করেছিলেন। কিন্তু ডক্টর নলিনীকান্ত ভট্টশালী ও অধ্যাপক সুখময় মুখোপাধ্যায় প্রমাণ করেছেন যে আত্ম-বিবরণটি প্রামাণ্য ও নির্ভরযোগ্য সূত্র। সুতরাং তা থেকে কবির জীবনের সামান্য কিছু কাহিনী আমরা জানতে পারি। কৃত্তিবাসের পূর্বপুরুষ নার সিংহ ওঝা (উপাধ্যায়) পূর্ববঙ্গ থেকে এসে নদীয়া জেলার ফুলিয়া গ্রামে বসতি করেন। নার সিংহের প্রপৌত্র বনমালীর জ্যেষ্ঠপুত্র হলেন কৃত্তিবাস। তাঁর মাতার নাম মালিনী। শ্রীপঞ্চমীর পুণ্য মাঘ মাসে আদিত্যবার (রবিবার) কৃত্তিবাসের জন্ম। বারো বৎসর বয়সে উত্তরবঙ্গে (অন্যমতে উত্তর রাঢ়ে) বিদ্যার্জন করে কবি কৃত্তিবাস গৌড়েশ্বর রুকনুদ্দীন বারবক সাহের (অধ্যাপক সুখময় মুখোপাধ্যায়ের মতে) সঙ্গে তাঁর সভায় দেখা করলেন সাতটি সুরচিত শ্লোক নিয়ে। কবি রাজসভার যে সুদীর্ঘ বর্ণনা দিয়েছেন তা আমরা উল্লেখ করলাম না। যা হোক, রাজা শ্লোক শুনে খুশী হয়ে কবিকে পুষ্পমাল্য চন্দন ও পট্টবস্ত্র দিয়ে সম্বর্ধিত করলেন। রাজার কাছে তিনি অনেককিছু প্রার্থনা করার সুযোগ পেয়েও চাইলেন শুধু — "যথা যাই তথায় গৌরব যাত্র সার"। সেই গৌরব তিনি পেলেন বিরাট জন-সম্বর্ধনায় —

চন্দনে ভূষিত আমি লোক আনন্দিত।
সবে বলে ধন্য ধন্য ফুলিয়া পন্ডিত॥
মুনি মধ্যে বাখানি বাল্মীকি মহামুনি।
পন্ডিতের মধ্যে কৃত্তিবাস গুনি॥

অধ্যাপক সুখময় মুখোপাধ্যায় মনে করেন — "কৃত্তিবাস রাজার সংবর্ধনালাভের আগে থাকতেই রামায়ণ রচনায় হাত দিয়েছিলেন। কারণ সংবর্ধনার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে জনতা এই উক্তি করেছে।[২] এর বেশী কোন তথ্য আর কবির সম্বন্ধে পাওয়া যায়নি।

১। সুখময় মুখোপাধ্যায় — কৃত্তিবাস পরিচয়, পৃঃ ৪৪

২। " — ঐ পৃঃ ২৬

(গ) কৃত্তিবাসের কাব্যপরিচয়

কৃত্তিবাসের রামায়ণ প্রথম মুদ্রিত হয় ১৮০২-৩ খৃস্টাব্দে শ্রীরামপুর মিশন থেকে উইলিয়ম কেরীর চেষ্টায়। এর আগে কয়েক'শ বৎসর ধরে হস্তলিখিত পুঁথিধৃত কৃত্তিবাসী রামায়ণই আপামর জনসাধারণের রসতৃষ্ণা মিটিয়েছে। এই রামায়ণের প্রাচীন পুঁথি বেশী পাওয়া যায়নি। কিন্তু ১৮শ শতাব্দীতে অনুলিখিত পুঁথি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও বিশ্বভারতীতে এপর্যন্ত যা সংগৃহীত হয়েছে, তার সংখ্যা দেড় হাজারেরও বেশী। তার মধ্যে সপ্তকান্ডে সম্পূর্ণ পুঁথি আছে মাত্র দুতিন খানা, অধিকাংশ ভিন্ন ভিন্ন কান্ডে লেখা। লক্ষণীয় এই যে এতগুলি পুঁথির একটির সঙ্গে আর একটির যথাযথ মিল কোথাও নেই। পঞ্চদশ শতকে রচিত কৃত্তিবাসের মূল রচনার কিয়দংশ এইসব পুঁথিতে পাওয়া যাবে কিনা বলা কঠিন। এর কারণ কবি কৃত্তিবাসের দীর্ঘকালস্থায়ী অসাধারণ জনপ্রিয়তা। জনসাধারণ বাল্মীকি রামায়ণ কি বস্তু তাও হয়ত জানেনা। কৃত্তিবাস-কথিত রাম কাহিনীর সহজ হৃদয়বেদ্যতা এবং তার অন্তর্নিহিত জীবনাদর্শ শতকের পর শতক ধরে বাঙ্গালী জনগণ পুঁথি পাঠে জেনেছে, শুনেছে কথকের মুখে। আর সাহিত্যিক ওয়াজেদ আলীর ভাষায় "সেই ট্রাডিশন আজও সমানে চলেছে"। ফলে কৃত্তিবাসের কাহিনী ও ভাষার রূপান্তর ঘটেছে প্রচুর, প্রক্ষিপ্ত বিষয় ঢুকে পড়েছে কালে কালে অনেক। এই বিষয়ে ডক্টর সুকুমার সেনের মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য।

> "জনপ্রিয়তার দামও কম দিতে হয় নাই। বহু শতাব্দী ধরিয়া গায়নের কণ্ঠে কণ্ঠে ফিরিয়া এবং অশিক্ষিত লিপিকরের হাতে পড়িয়া কৃত্তিবাসের শ্রী রাম পাঁচালী খোল ও নলিচা দুই বদলাইয়াছে বারে বারে।..... যাহারা অনধিক দুইশত বৎসরের পুরাতন পুঁথি দেখিয়া কৃত্তিবাসের কাব্যের মূলরূপ উদ্ধারের আশা করেন, তাঁহাদের অধ্যবসায় অসম সাহসিকতার নামান্তর। কৃত্তিবাসের কাব্যের মূলের কথা দূরে থাক, বিশেষ প্রাচীন রূপ পাই নাই। তাহাতে ক্ষতি থাকিলেও বিশেষ ক্ষোভ নাই। ..... গায়ন লিপিকরেরা কবির বাণীকে নিজেদেরই বাণীরূপে বরণ করিয়া কাব্যটির ললাটে নবীনতার জয়টীকা পরাইয়া আসিয়াছেন পুরুষে পুরুষে।"[১]

কৃত্তিবাসের পরে দীর্ঘকাল ধরে বাংলায় রামায়ণ রচনার উদ্যম লক্ষিত হয়েছে। বলা বাহুল্য, পরবর্তী রচয়িতারা বাল্মীকি রামায়ণের চাইতেও বেশি নির্ভর করেছেন অগ্রজ

১। ডক্টর সুকুমার সেন — বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, ১ম খন্ড, পৃ: ১০৫

রামায়ণ ও অদ্ভুত রামায়ণের উপর। ডক্টর দীনেশচন্দ্র সেনের বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে কৃত্তিবাস পরবর্তী ১৪ জন রামায়ণ রচয়িতার নাম দেওয়া হয়েছে। অধ্যাপক মনীন্দ্র মোহন বসুর 'বাঙ্গলা সাহিত্যে'র দ্বিতীয় খণ্ডে ৩৮ জন রামায়ণ রচয়িতার নাম পাই। এর মধ্যে রাজকৃষ্ণ রায় ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে এবং গঙ্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ১৮৮৫-৮৯ খৃষ্টাব্দে বাল্মীকি রামায়ণের আক্ষরিক অনুবাদ করেছিলেন।

(ঘ) কৃত্তিবাসের কাব্যে বাঙালী জনজীবনের প্রতিচ্ছবি

কৃত্তিবাসের পরে বাংলায় এতগুলো রামায়ণ রচনা হয়ে থাকলেও কৃত্তিবাসকে আজো কেউ অতিক্রম করতে পারেননি। তার প্রধান কারণ, বাল্মীকি রামায়ণকে ভিত্তি করলেও কৃত্তিবাসের রামায়ণ-পাঁচালী বাঙালীর সমাজ ও জীবনরস নিষ্ণাত। বাল্মীকি সৃষ্ট মহান ও আদর্শ নরনারী চরিত্রসমূহকে বাঙালী কৃত্তিবাসী-রামায়ণের দর্পনে দেখতে পেয়েছে নিজের ঘরের পিতামাতা ভাইবোন বন্ধুদের মত ক'রে। রামায়ণী কথাকে বাঙালীর এমন অন্তরঙ্গ এমন হৃদয়ের বস্তু আর কেউ ক'রে তুলতে পারেননি। এক কথায় বলা চলে কৃত্তিবাসের হাতে বাল্মীকি বাঙালীত্ব লাভ করেছেন।

ঠিক এমনিতর ব্যাপার ঘটেছে হিন্দী সাহিত্যের মহাকবি তুলসীদাসের "রামচরিত-মানসে" এবং নেপালী সাহিত্যের মহাকবি আচার্য ভানুভক্তের রামায়ণে। তাঁদের কাব্যেও প্রতিফলিত হয়েছে পূর্বভারত ও নেপালের সমাজজীবনের ধ্যানধারণা বিশ্বাসের প্রতিচ্ছবি। যা হোক, কৃত্তিবাসী রামায়ণ কী ভাবে বাঙালী জীবনচেতনার সঙ্গে একীভূত হয়ে গেছে তা সুন্দরভাবে বলেছেন ড: অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় —

> "বলিতে কি, বাঙালীর দৈনন্দিন জীবিকা এবং জীবিকা বহির্ভূত মানসিক ঐতিহ্যের প্রতিটি পর্য্যায়ের সহিত কৃত্তিবাসী রামায়ণ ওতপ্রোতভাবে জড়াইয়া গিয়াছে। প্রবচনে, প্রাত্যহিক জীবনে, সুখে দুঃখে কৃত্তিবাসী রামায়ণ আমাদের আত্মার খাদ্য-পানীয় সংগ্রহ করিয়া দিয়াছে, ...কৃত্তিবাস বাঙালী জীবনের মূল সুর যেন প্রাক্তন সুকৃতিবশেই ধরিতে পারিয়াছিলেন। বাঙালী যাহা চাহিয়াছে, কৃত্তিবাসী রামায়ণে তাহা সে পাইয়াছে। বাঙালী জীবনের কাল-নিরপেক্ষ এমন একটা সামগ্রিক রূপ কৃত্তিবাসী রামায়ণে বিকশিত

> হইয়াছে যে, মনে হয় তিনি যেন পুরাণকথার আধারে বাঙালীর জীবন-রসকেই পরিবেশন করিয়াছেন ।"[১]

ডক্টর বন্দ্যোপাধ্যায় এখানে "বাঙালী জীবনের মূল সুর" বলতে কি বুঝিয়েছেন তা বিশদ করা প্রয়োজন । কোমল হৃদয়াবেগ, করুণরস প্রবণতা, শান্ত গার্হস্থ্য জীবনের স্নেহমধুর পরিবেশে আসক্তি, সর্বোপরি ভক্তি ব্যাকুলতা — এইসব কমনীয় ধাতুতে বাঙালীর চিত্তবৃত্তি গড়ে উঠেছে । কৃত্তিবাসী রামায়ণে বাল্মীকি রামায়ণের মূল কাহিনী এবং চরিত্রগুলো ঠিকই রয়েছে বটে, কিন্তু তার রূপান্তর ঘটানো হয়েছে বাঙালীর উল্লিখিত চারিত্র লক্ষণের অনুকূল ক'রে । এরই জন্যে কৃত্তিবাসের চিরঞ্জীব জনপ্রিয়তা । দশরথ কর্তৃক সিন্ধুবধ, রামের বনগমনকালে দশরথ কৌশল্যা সহ সমগ্র নগরীর শোকোচ্ছ্বাস, সীতাহরণে রামের বিলাপ, লক্ষ্মণের শক্তিশেলের বেদনা, সীতার অগ্নিপরীক্ষা ও পুনর্নির্বাসন, সীতার পাতাল প্রবেশ প্রভৃতি নানা ঘটনার বর্ণনায় কোমল হৃদয়াবেগের ও করুণরসের প্রাধান্য সহজেই চোখে পড়বে । যুদ্ধ বিগ্রহের বর্ণনা থাকলেও বাল্মীকি-রামায়ণ মূলত গার্হস্থ্য জীবনরসের কাব্য । রবীন্দ্রনাথ সুন্দর বলেছেন —

> "বাহুবল নহে, জিগীষা নহে, রাষ্ট্রগৌরব নহে, শান্ত রসাস্পদ গৃহধর্মকেই রামায়ণ করুণার অশ্রুজলে অভিষিক্ত করিয়া তাহাকে সুমহৎ বীর্যের উপরে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে ।"[২]

বাল্মীকি রামায়ণে করুণ গার্হস্থ্যরসের সঙ্গে বীর্যবত্তাও জড়িত ছিল । কৃত্তিবাসী রামায়ণে অধিকাংশ চরিত্রকেই বাঙালী গৃহসংসারের প্রতিনিধি মনে হয়, তারা স্নেহদুর্বল, প্রেমকাতর, নিয়তি নির্ভর, ভক্তি বিগলিত । বাল্মীকির পুরুষ চরিত্র দশরথ, রাম, লক্ষ্মণ, ভরত, রাবণ, বিভীষণ-ইন্দ্রজিৎ-সুগ্রীব, অঙ্গদ, হনুমান; নারীচরিত্র কৈকেয়ী সীতা-মন্থরা, তারা, মন্দোদরী প্রভৃতি একদিকে বিশেষ দোষগুণের প্রতীক, আবার অন্যদিকে স্বকীয় চরিত্রবৈশিষ্ট্যে স্বতন্ত্র । কোন চরিত্রই আর্য মহাকাব্যের মহান বিশালতা ও উত্তুঙ্গ আদর্শকে ক্ষুণ্ণ করেনি । হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বলেছেন —

> "বাল্মীকি আদর্শ মানুষ, আদর্শ রমণী, আদর্শ রাজা, আদর্শ শাসন-প্রণালী, আদর্শ ভৃত্য এবং আদর্শ শত্রুর বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন ।"[৩]

১। ড: অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় — বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, প্রথম খণ্ড, পৃ ৫২৩-২৪

২। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর —"প্রাচীন সাহিত্য" গ্রন্থে 'রামায়ণ' প্রবন্ধ ; রবীন্দ্র রচনাবলী ৫ম খণ্ড পৃ: ৫০০

৩। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী -- বাল্মীকির জয়, ১৮৮১

তাই বাল্মীকির রামচন্দ্র শ্রেষ্ঠ বীর, ক্ষমাশীল ও আশ্রিতের প্রতিপালক, শুদ্ধসত্ত্ব ত্যাগপরায়ণ, ভ্রাতৃস্নেহে, পত্নীপ্রেমে উদ্বেল, আবার কখনো বিরহ বেদনায় বিহ্বল, দেবলক্ষণযুক্ত পরিপূর্ণ মনুষ্য তিনি। লক্ষ্মণ ভ্রাতৃভক্ত, আত্মসুখত্যাগী, পুরুষকার দৃপ্ত, বাস্তববোধসম্পন্ন বীরপুরুষ। দশরথ শক্তিমান প্রজাবৎসল রাজা, অপত্যস্নেহশীল পিতা, সত্যসন্ধ পুরুষ অথচ দুর্বল স্বামী। কৈকেয়ী রূপগর্বিনী উদ্ধতস্বভাবা আত্মস্বার্থপরায়ণা কঠিনচিত্তা রমণী। ভরত নিঃস্বার্থ ভ্রাতৃভক্ত, ত্যাগ ও তিতিক্ষায় পূত, ত্রুটিহীন চরিত্র। বালি দৃঢ়চেতা বীর, সুগ্রীব বন্ধুত্বের মর্যাদারক্ষায় উৎসর্গীকৃত প্রাণ। হনুমান শুধু প্রভুভক্ত নয়, সর্বশ্রেষ্ঠ বীর, শাস্ত্রবিৎ পন্ডিত, কঠিন দুঃসাধ্য কার্যে কৃতকৌশল, প্রত্যুৎপন্নমতি ও সুস্থির। সীতা পতিপরায়ণা দুঃখ বেদনায় অবিচলিতা, কোমলহৃদয়া অথচ প্রয়োজন ক্ষেত্রে দৃপ্তা পাবকশিখারূপিনী। দীনেশচন্দ্র সেনের ভাষায় — "সীতার কাহিনী দুঃখ পবিত্রতা এবং ত্যাগের কাহিনী।"[১] আর রাক্ষসরাজ রাবণ সম্পর্কে হনুমানের উক্তিই যথেষ্ট — "এই বীরের কি রূপ! কি ধৈর্য, কি শক্তি, কি কান্তি! সর্বাঙ্গে কি সুলক্ষণ! যদি অধর্ম ইহার বলবৎ না হইত তাহা হইলে ইনি সুরলোক অধিক কি ইন্দ্রত্বও রক্ষক হইতেন।"[২] বাল্মীকি অংকিত এই সমস্ত চরিত্র বাঙালী কবি কৃত্তিবাসের হাতে কিভাবে রূপায়িত হয়েছে তা সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন ডঃ অমিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

> "কৃত্তিবাসের রামচন্দ্র প্রেমের দেবতা, ভক্তপ্রাণ, অশ্রুজলে আবেগব্যাকুল; লক্ষ্মণ অপরিণামদর্শী উদ্ধত, স্ত্রৈণ দশরথ অসহায় ক্লীবী মাত্র; কৈকেয়ী নীচ স্বার্থকামী; ভরতের মহত্ত্ব ও ত্যাগ রক্তমাংসহীন শিল্পিত আদর্শের নিষ্প্রাণতায় সমাচ্ছন্ন; বালি সুগ্রীব হনুমানাদি শাখামৃগত্বের উর্ধ্বে উঠিতে পারে নাই; সীতা সর্বংসহা কান্তকোমল শাশুড়ীতর্জিতা ও ননদী-ভীতা বঙ্গবধূর অস্থিহীন কোমল মূর্তিমাত্র। রাক্ষস রাবণ একাধারে বর্বর, দুর্বিনীত, অপরদিকে প্রচ্ছন্ন ভক্তির গঙ্গোদকে নিত্যস্নায়ী। বীরবাহু, তরণীসেন, অহিরাবণ-মহীরাবণ কেহ ভক্তিরসে, কেহ বীররসে, কেহ করুণরসে, আর্দ্র হইয়া সজল বাংলা দেশে প্রকৃতিকেই যেন স্বীকার করিয়া লইয়াছে।"[৩]

মহাকাব্যের দৃঢ়নিবন্ধ রূপ নিয়ে বাল্মীকি রামায়ণের সুর এক উদাত্ত গম্ভীর সংযতকে বাঁধা হয়েছে। তাতে প্রয়োজনক্ষেত্রে শ্লেষ বিদ্রূপ রয়েছে বটে, কিন্তু তরল রঙ্গরস নেই।

১। দীনেশচন্দ্র সেন — রামায়ণী কথা, পৃঃ ১৬৯

২। হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য অনুবাদিত 'বাল্মীকি রামায়ণ', ২য় খন্ড, পৃ ৬৪৫

৩। ডঃ অমিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় — বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, ১ম খন্ড, পৃ ৫২৮

83285 4 OCT 1983

কৃত্তিবাসী রামায়ণ রচিতই হয়েছে জনসাধারণের উপভোগ্য পাঁচালীর ভঙ্গিতে। তাই তাতে বাঙালী সমাজে ও গৃহস্থজীবনে নিত্য অভ্যস্ত ঘরোয়া বাক্‌রীতি স্থূল হাস্যপরিহাস রঙ্গ এসে পড়েছে অনেক সময় গুরুতর পরিস্থিতিতেও। তাছাড়া পশ্চিমবঙ্গের নানা স্থান-নাম, নানা আচারব্যবহার সামাজিক রীতিনীতি বিচিত্র খাদ্যদ্রব্যের উল্লেখে পরিপূর্ণ এই কাব্য যেন বাঙালীরই আত্ম-প্রতিবিম্ব। রামায়ণ কাহিনীকে এইভাবে বাঙালীর জীবনরসে রসান্বিত ক'রে উপস্থাপিত করেছিলেন বলেই কৃত্তিবাস বাঙ্গার জাতীয় কবি। অনুবাদ হিসাবে নয়, তাঁর কাব্য এক মৌলিক সৃষ্টির উজ্জ্বল নিদর্শন হিসাবেই বাঙ্গালী গ্রহণ করেছে।

(৬) বাল্মীকি ও কৃত্তিবাস

আগেই বলা হয়েছে কৃত্তিবাসের মূলভিত্তি বাল্মীকি রামায়ণ, যদিও তাতে বাল্মীকি-বর্ণিত কিছু বিষয় বাদ পড়েছে — আবার বাল্মীকি-বহির্ভূত নানা বিষয় ঢুকে পড়েছে। অনেকে মনে করেন মূল বাল্মীকি-রামায়ণের সঙ্গে কৃত্তিবাসের প্রত্যক্ষ পরিচয় বা যোগ ছিলনা, তিনি সংস্কৃত জানতেন না, তৎকালীন কথক ও গায়েনদের কাছে প্রচলিত রামায়ণ কথা শুনে এবং সেই সঙ্গে আপন কল্পিত কাহিনী যুক্ত করে লোকরঞ্জন এই পাঁচালী তিনি রচনা করেছিলেন। এই ধারণা কিন্তু ঠিক নয়। কৈশোর ও যৌবনে তিনি গুরুগৃহে তৎকাল প্রচলিত সংস্কৃত শিক্ষাই নিয়েছিলেন। ধ্রুবানন্দ মিশ্র রচিত কুলজী গ্রন্থ "মহাবংশাবলী"তে (১৫০০-১৫১০) কৃত্তিবাস সম্বন্ধে উক্তি — "কৃত্তিবাস: কবিধীমান" কোন সুপণ্ডিত ব্যক্তি সম্বন্ধে প্রযোজ্য হতে পারে না। তাঁর কবিতায় মুখ্য জনপ্রশস্তিতেও দেখি — "পণ্ডিতের মধ্যে কৃত্তিবাস গুণি"। নানা ভনিতায় তিনি নিজেকে "পণ্ডিত" বলে উল্লেখ করেছেন; এ শুধু অহমিকা নয়, সাধারণ্যে নিশ্চয়ই তিনি পণ্ডিত বলে পরিচিত ছিলেন। তাঁর কাব্যের নানা স্থলে বাল্মীকির সশ্রদ্ধ উল্লেখও চোখে পড়ে। অন্যান্য ভারতীয় ভাষায় রচিত রামায়ণসমূহের তুলনায় কৃত্তিবাস অনেক বেশী পরিমাণে বাল্মীকি রামায়ণের উপর নির্ভর করেছিলেন তা নি:সন্দেহে বলা চলে। কৃত্তিবাস যে বাল্মীকি রামায়ণের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন তা আরো বোঝা যায় যখন তিনি কখনো কখনো বাল্মীকি-বহির্ভূত বিষয় গ্রহণ সম্বন্ধে নিজেই উল্লেখ করেছেন এবং তার উৎস ভিন্নতর রামায়ণ বলে নির্দেশ করেছেন। যা হোক, দেখা যাবে, বাল্মীকির "বালকান্ডে"র নানা ঘটনার সঙ্গে কৃত্তিবাসের "আদিকান্ডে"র পার্থক্যই তুলনায় বেশী। বাল্মীকির "উত্তরকান্ডে"র নব-কুশ প্রসঙ্গ কৃত্তিবাস তাঁর

'আদিকান্ডে' অ-তর্ভুক্ত করেছেন ।

প্রথম পার্থক্য লক্ষ্য করি উভয় কাব্যের প্রারম্ভেই । বাল্মীকি রামায়ণের আরম্ভ, বাল্মীকি কর্তৃক নারদকে সর্বগুণান্বিত আদর্শ পুরুষ সম্পর্কে প্রশ্ন দিয়ে । তার উত্তরে নারদ কর্তৃক রামচরিত্র ব্যাখ্যান । তমসা নদীতীরে ব্যাধ কর্তৃক ক্রৌঞ্চ হত্যায় বাল্মীকির মুখে শ্লোকের সঞ্চার, ব্রহ্মার আবির্ভাব ও বাল্মীকিকে রামায়ণ রচনার আদেশ, বাল্মীকি কর্তৃক রামায়ণ রচনা ও লবকুশকে উহা শিক্ষাদান, রামের রাজসভায় লবকুশের রামায়ণ গানে অযোধ্যা বর্ণনা থেকে রামায়ণ কাহিনীর সুরু । অপরদিকে কৃত্তিবাসী রামায়ণে দেখি — নারায়ণের চারি অংশে আবির্ভাব বর্ণনা, রত্নাকর দস্যুর হৃদয় পরিবর্তন, ব্রহ্মা কর্তৃক তার বাল্মীকি নামকরণ ও রামায়ণ রচনার নির্দেশ দান দিয়ে কাব্য শুরু । বাল্মীকি রামায়ণের "বালকান্ডের" কিছু কিছু ঘটনা কৃত্তিবাসী রামায়ণে গৃহীত হয়নি । যেমন — সমুদ্রমন্থন কাহিনী, ইন্দ্র কর্তৃক দিতির গর্ভবিদারণ, কার্তিকের জন্ম, শবলা ধেনু নিয়ে বশিষ্ট ও বিশ্বামিত্রের বিরোধ, ত্রিশংকু, অম্বরীষ, মেনকা, রম্ভা প্রসঙ্গ, বিশ্বামিত্রের তপস্যা ও ব্রাহ্মণত্ব লাভ, রামচন্দ্র কর্তৃক আদিত্য স্তব পাঠ । লক্ষণীয় বাল্মীকিতে যেটি "যুদ্ধকান্ড", কৃত্তিবাসে তা "লংকাকান্ড", বাল্মীকির 'বালকান্ড' হয়েছে কৃত্তিবাসে 'আদিকান্ড'। ছোটখাট পার্থক্যও কিছু চোখে পড়বে না তা নয় । যেমন সুন্দরাকান্ডে লংকার অধিষ্ঠাত্রী রাক্ষসীর নাম বাল্মীকিতে 'লংকা'; কৃত্তিবাসে 'চামুন্ডা'; বিভীষণ কন্যা 'কলা' কৃত্তিবাসে 'সানন্দা'; রাক্ষস 'অবিন্ধ্য' কৃত্তিবাসে 'অরবিন্দ'; সীতানিগ্রহী কাক কৃত্তিবাসে 'জয়ন্ত কাক'; হনুমানকে সীতার দেওয়া অভিজ্ঞান 'চূড়ামণি' কৃত্তিবাসে 'শিরোমণি'। এইসব পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও বলা যায় — ঘটনা ও চরিত্রে কিছু কিছু শৈথিল্য থাকা সত্ত্বেও কৃত্তিবাস বাল্মীকি রামায়ণের কাহিনীগত পারম্পর্য অনেকটা রক্ষা করেছেন তাঁর কাব্যে ।

(চ) কৃত্তিবাসী রামায়ণের কিছু কাহিনীর ভিন্নতর উৎস

আগেই বলা হয়েছে, কৃত্তিবাসী রামায়ণের কাহিনীর প্রধান উৎস বাল্মীকি রামায়ণ হলেও নানা ক্ষেত্রে কৃত্তিবাস বিভিন্ন রামায়ণ ও পুরাণ থেকে পরিপূরক কাহিনী নিয়ে তাঁর পাঁচালীকে জনগণের উপভোগ্য করতে চেয়েছেন । বাল্মীকি রামায়ণ ছাড়াও, পরবর্তীকালের অন্তত: তিনটি সংস্কৃত রামায়ণ তখন এদেশে বেশ প্রচলিত ছিল — যেমন অদ্ভুত রামায়ণ,

অধ্যাত্ম রামায়ণ ও যোগবাশিষ্ট রামায়ণ। কৃত্তিবাসের পরে বাংলায় যাঁরা রামায়ণ রচনা করেছিলেন, তাঁরা বাল্মীকির রামায়ণের চাইতেও বেশী নির্ভর করেছিলেন অদ্ভুত রামায়ণ ও অধ্যাত্ম রামায়ণের উপর। কৃত্তিবাস প্রধানতঃ অধ্যাত্ম রামায়ণ থেকেই কিছু কাহিনী নিয়েছেন। যেমন — আদিকান্ডে বর্ণিত রত্নাকর দস্যুর কবি-বাল্মীকিতে পরিণত হওয়ার কাহিনীর উৎস অধ্যাত্ম রামায়ণের অযোধ্যাকান্ডের ষষ্ঠ সর্গ। বিশল্যকরণী ঔষধ আনবার সময় হনুমানের সঙ্গে কালনেমির যুদ্ধের কাহিনী নেওয়া হয়েছে অধ্যাত্ম রামায়ণের যুদ্ধ-কান্ডের ৬ষ্ঠ ও ৭ম সর্গ থেকে। রামাভিষেকের পর সীতাপ্রদত্ত পুরস্কার সুর্ণহার হনুমান কর্তৃক জলে নিক্ষেপ ও নিজবক্ষ বিদীর্ণ করে রাম-নাম প্রদর্শন কাহিনীর উৎসও অধ্যাত্ম রামায়ণের যুদ্ধকান্ডের ১৬শ অধ্যায়।

অন্যান্য রামায়ণ এবং পুরাণ থেকেও কৃত্তিবাস নানা উপাদান নিয়েছেন এই তথ্য জানিয়েছেন অধ্যাপক মনীন্দ্রমোহন বসু তাঁর "বাঙ্গালা সাহিত্য" ২য় খন্ডে। যেমন — ভগীরথের জন্মবৃত্তান্তের উৎস যোগবাশিষ্ট রামায়ণ, পদ্মপুরাণ, ও স্কন্দপুরাণ; কুম্ভকর্ণ নিধন বর্ণনায় চৌষট্টি যোগিনীর সক্রিয়তার ধারণাটি নেওয়া হয়েছে অদ্ভুত রামায়ণ থেকে। সেখানে দেখি, সহস্রস্কন্ধ রাবণ বধকালে সীতার অঙ্গ থেকে উদ্ভূত হয়েছিল চৌষট্টি যোগিনী। শনির দৃষ্টিতে দশরথের পতন ও জটায়ু কর্তৃক ধারণ কাহিনীর উৎস — স্কন্দপুরাণ ও কালিকাপুরাণ। হরিশ্চন্দ্র উপাখ্যানটি নেওয়া হয়েছে দেবী ভাগবত ও মার্কন্ডেয় পুরাণ থেকে। রামচন্দ্রের দেবীপূজার ও অকালবোধন কাহিনীর উৎস কালিকাপুরাণ, দেবীভাগবত ও বৃহদ্ধর্মপুরাণ, লবকুশের যুদ্ধঘটনা গৃহীত হয়েছে জৈমিনী-ভারত ও পদ্মপুরাণ থেকে। সেতুবন্ধনকালে রামচন্দ্রের শিবস্থাপনা কাহিনীর উৎস কূর্মপুরাণ, শিবপুরাণ ও অধ্যাত্ম-রামায়ণ। যে ভক্তিবাদ ও রামমহিমাকীর্তনে কৃত্তিবাসী রামায়ণ মুখর, তাও সম্পূর্ণ কৃত্তিবাসের সকীয় উপলব্ধিপ্রসূত নয়। পূর্বোক্ত রামায়ণ পুরাণাদি, বিশেষ করে অধ্যাত্ম রামায়ণ ও যোগবাশিষ্ট রামায়ণে এই ভক্তিবাদ সুস্পষ্ট। সেখানে রাবণ, কুম্ভকর্ণ, বিভীষণ, কালনেমি, মন্দোদরী, সকলেই রামভক্ত, কৃত্তিবাসী রামায়ণে তা সংক্রামিত হয়েছে মনে হয়।

এছাড়া এমন কতকগুলো ছোট বড় কাহিনী (বাল্মীকি বহির্ভূত) কৃত্তিবাসী রামায়ণে রয়েছে যা হয় কৃত্তিবাসের সকপোলকল্পিত, অথবা গায়ক বা কথক ঠাকুরদের দ্বারা এর অন্তর্ভুক্ত হয়ে গিয়েছে পরবর্তীকালে। এসব কাহিনী হয়ত বা জনসাধারণের মধ্যে প্রচলিত

ছিল, কাহিনীর সঙ্গে সুসঙ্গত ও উপভোগ্য হবে বলে গায়ক কথকদের দ্বারা এগুলি পরবর্তী কালে প্রক্ষিপ্ত হয়ে কৃত্তিবাসী রামায়ণের মূল রূপকে আচ্ছন্ন করে দিয়েছে। কাব্যদেহ থেকে এগুলি আজ বিচ্ছিন্ন করা সম্ভব নয়, এদের নিয়েই কৃত্তিবাসী রামায়ণের চির-নবত্ব। এমনি কতকগুলো কাহিনীর উল্লেখ এখানে করছি।

মা-ধাতার উপাখ্যান, সৌদাস রাজা-দিলীপ ও রঘুর উপাখ্যান, ঋষ্যশৃঙ্গ মুনি ও লোমপাদ রাজ্যের কাহিনী, গণেশ জন্ম, দশরথের যজ্ঞ ও চরু বিভাগ, শ্রীরামের জন্মে রাবণের আতঙ্ক, বানরগণের জন্মবিবরণ, হরধনুভঙ্গে রাবণের ব্যর্থতা ও পলায়ন, শ্রীরামের সঙ্গে গুহকের মিত্রতা, বিশ্বামিত্রের অনুরোধে দশরথের প্রথম ছলনা ক'রে ভরত-শত্রুঘ্নকে প্রেরণ ও পরে রাম-লক্ষ্মণকে প্রেরণ, সুবাহুর বধ, শ্রীরাম কর্তৃক দশরথের শ্রাদ্ধ, দশরথের উদ্দেশ্যে সীতার পিণ্ডদান ও ব্রাহ্মণ তুলসী ও ফল্গুনদীকে অভিশাপ, অশোককাননে ইন্দ্র কর্তৃক সীতার আহারের ব্যবস্থা, সীতার অন্বেষণে বানরগণের পাতাল প্রবেশ, রামায়ণ শ্রবণে সম্পাতির পক্ষলাভ, সুরসা কর্তৃক লংকাযাত্রী হনুমানকে বাধাদান, লংকাদহনে হনুমানের মুখ দগ্ধ হওয়া, সেতু-বন্ধনে কাঠবিড়ালীর সহায়তা, বিভীষণকে রাবণের পদাঘাত, রাবণের প্রতি শ্রীরামের শরসন্ধান ও রাবণের পলায়ন, যুদ্ধদর্শনের জন্য দেবগণের অন্তরীক্ষে আগমন ও হর পার্বতীর কলহ, অঙ্গদের রায়বার, বীরবাহু ধূম্রাক্ষ ভীমাক্ষের যুদ্ধে পতন, মন্দোদরী কর্তৃক রাবণের সীতাবধে বাধাদান, হনুমান কর্তৃক সূর্যকে কক্ষতলে স্থাপন, হনুমানের গন্ধমাদন সহ লংকাযাত্রা, নন্দীগ্রামে হনুমান কর্তৃক ভরতকে পরীক্ষা, মহীরাবণ-অহিরাবণ-তরণীসেন বধ কাহিনী, দেবীপূজার জন্য হনুমানের একশত আটটি নীলপদ্ম আনয়ন, দেবী কর্তৃক একটি পদ্ম হরণ, শ্রীরামের চক্ষুদান সংকল্প, হনুমানের চণ্ডীর শ্লোক বিলোপকরণ ও চণ্ডীপাঠে ভ্রমোৎপাদন, হনুমান কর্তৃক মন্দোদরীর কাছ থেকে রাবণের মৃত্যুবাণ হরণ, মুমূর্ষু রাবণের নিকট রামের রাজনীতি শিক্ষা, শ্রীরামের নিকট মন্দোদরীর অবৈধব্য বরলাভ, সীতাকে মন্দোদরীর অভিশাপ, গজকচ্ছপের বৃত্তান্ত, রাম কর্তৃক রজকের মুখে সীতা-নিন্দা শ্রবণ, সীতা কর্তৃক রাবণ-মূর্তি অংকন, শ্রীরাম কর্তৃক সুবর্ণসীতা নির্মাণ প্রভৃতি।

এই সমস্ত বিভিন্ন উপাদান গ্রহণ করায় কৃত্তিবাসী রামায়ণের মৌলিকতা কিছু ক্ষুণ্ণ হয়েছে বলে মনে হয় না, বরং এতে তাঁর কাব্যে বৈচিত্র্যই সম্পাদিত হয়েছে। প্রসঙ্গক্রমে আবার বলা দরকার — এর অনেককিছুই পরবর্তীকালে কৃত্তিবাসী-রামায়ণে প্রক্ষিপ্ত বলে পণ্ডিতরা মনে করেন, এবং তাঁদের ধারণা অহেতুক বা অমূলক নয়।